শান্তিনিকেতনে কণ্ঠবিজ্ঞানের অভিসার

- *মো: আনিসুর রহমান*

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ

আমি ২০০৪-এর শেষের দিকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজিত বসুর কাছে আমার বাসায় নিজস্ব কম্পিউটারে গান করা 'মহারাজ' সিডিটা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। কয়েক মাস পরে তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই এই মর্মে যে তিনি সেটা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, এবং আমি ওদিকে গেলে যেন তাঁকে জানাই, সামনা-সামনি বসে আমার গান শুনবেন। আমি উত্তরে জানাই যে আমি ২০০৫-এর শেষের দিকে শান্তিনিকেতন যেতে পারি, এবং গেলে সেখানে কণ্ঠ বিজ্ঞানের ওপর একটা কোর্স-জাতীয় দিতে পারি।

গত বছরের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সস্ত্রীক কলকাতায় বেড়াতে যাই এবং সেখান থেকে অধ্যাপক বসুকে ফোন করি। তিনি আমাকে ১লা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে চলে আসতে বলেন এবং বলেন যে তিনি ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এলাহাবাদ চলে যাবেন, এর আগেই তিনি আমার জন্য একটা সেমিনার অর্গানাইজ করতে চান।

"গানের লীলার সেই কিনারে"

শান্তিনিকেতন যাবার আগে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এবং গীতনাট্য ও অপেরা ডিরেক্টর দেবাশীষ রায় চৌধুরীর আমন্ত্রণে তাঁর একটি নতুন প্রোডাকশনে যোগ দিই। দেবশীষ রায় চৌধুরী ভারত সরকার থেকে একটি অনুদান নিয়ে"গানের লীলার সেই কিনারে" নাম দিয়ে একটি ফিচার করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে বিদেশে যেয়ে সেখানকার কিছু গান শুনে এবং শিখে দেশে ফিরে এসে সেই সব গানের সুর অবলম্বনে যে সব গান রচনা করেছিলেন তাদের থেকে কিছু নির্বাচিত গান নিয়ে সেগুলির অরিজিনাল ভার্শন ও তাদের বাংলা ভার্শন অবলম্বনে গান-অভিনয়-নাচ নিয়ে রচিত এই ফিচারটি। এতে আমাকে দিয়ে তিনি "পুরানো সেই দিনের কথা" গানটি করান অভিনয়-সহ, আর এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে বহুবছর পরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা এরকম একটি সীনে। শ্রীরামপুরের একটি পুরানো বিরাট জমিদার বাড়ীর ছাদে এই সীনটির সুটিং হয়। ফিচারটি অসাধারণ সুন্দর ও দক্ষ একটি প্রেডাকশন (আমার এ্যামেচারিশ পারফরমেন্স বাদ দিলে!), যেটি মাস দুই আগে দূরদর্শন থেকে প্রচারিত হয়।

কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর বক্তৃতা

১লা ডিসেম্বর সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন যাই। উপাচার্য সুজিত বসু সেই রাতে তাঁর বাসায় চায়ে নেমন্তন্ন করেন এবং অল্প কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুকে ডাকেন একটি ঘরোয়া গানের আড্ডায়। আসরে আমি ছাড়া উপাচার্যের সঙ্গীত-শিক্ষার্থী স্ত্রী এবং শ্রীনেকেতনের সঞ্জিত সেন (রাজা) গান করেন। এই তরুণ শিল্পীর গানে বেশ মডুলেশন ছিল যা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের গানে সাধারণতঃ শোনা যায় না, এবং যা আমার ও আমার স্ত্রীর খুবই ভালো লাগলো।

২রা ডিসেম্বর বিকেলে উপাচার্য রবীন্দ্র-ভবনের কেন্দ্রীয় সভাঘরে আমার জন্য "রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞান"-এর ওপর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। হলভর্তি শ্রোতাদের কাছে এক ঘন্টার মতো বক্তৃতায় আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞানের একটা ওভারভিউ দেই। উপাচার্য ডায়াসে আমার পাশে বসে ছিলেন । বক্তৃতার আগে উপাচার্য আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের আঁকা এক সেট ছবির কপি উপহার দেন, এবং আমি তাঁর হাতে বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর জন্য আমার *"সংস অব টাগোর, ফিলসফি, ট্রান্সলেশনস, পেইন্টিংস"* বইটি উপহার দিই। বক্তৃতায় এক জায়গায় বলছিলাম যে *"ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী"* গানে *"যেন হৃদয়ে বহু দূরে"* এই চরণের সুরটি ওপরের পঞ্চমে গেছে, কিন্তু এই কথাটি গাইতে হৃদয়ের বহুদূরের আভাসটি দেবার জন্য খুব সূক্ষভাবে পঞ্চম ছুঁতে হবে, ফুটিয়ে নয়, এবং এতো উঁচু পর্দা সূক্ষভাবে স্পর্শ করবার জন্য বিশেষ রকম কণ্ঠসাধনা প্রয়োজন। একজন সিনিয়র শ্রোতা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ওই গানটি গেয়ে শোনাতে । আমি বলি-যে আমার বক্তৃতার শেষে গানটি শোনাব।

বক্তৃতা শেষে আমি দুটো কন্ট্রাস্টিং গান করি - প্রথমে *"থামাও রিমিকি ঝিমিকি"* যাতে ওপরের দিকে বলিষ্ঠ করে সুর উছলিয়ে দিয়ে গাওয়ার গান, ও পরে *" ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী"* যে গানে স্বপ্নের মতো স্মৃতির অভিসার । গান শেষে আমার পার্টিসিপেটরি স্টাইল অনুযায়ী শ্রোতাদের আলোচনায় আহ্বান করি। সেই ভদ্রলোক যিনি আমাকে বক্তৃতাকালে *"ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী"* গানটি গেয়ে শোনাতে বলেছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে আমাকে তাঁরা খুব দেরীতে পেলেন, এবং আরো আগে পেলে তাঁরা অনেক উপকৃত হতেন। পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় - তিনি সঙ্গীত ভবনের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধ্যাপক সিতাংশু রায়। আরো আলোচনা করেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষক আলপনা রায় আমার *"অসীমের স্পন্দ"* বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে, এবং একথা বলে যে বইটা বেরোবার পর পরই তিনি সেটা আনিয়ে পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে গানও করতে পারি একথা তিনি জানতেন না। আমি একটু হাসি, এই ভেবে যে ভালোমন্দ কোনরকম গান করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ওরকম একটা বই বোধ হয় লেখা যায় না!

পরের দিন সঙ্গীত ভবনে যাই সেখানকার প্রিন্সিপাল ও ক্লাসিকাল বিভাগের প্রধান মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে। মোহন সিং-কে পাই না তিনি সেসময় দিল্লীতে ছিলেন ভারত সরকারের কাছ থেকে সঙ্গীতে একটি পুরষ্কার নেবার জন্য। দেখা হয় নাটক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তারক সেনগুপ্তের সঙ্গে।

তারক সেনগুপ্ত আমার ২রা ডিসেম্বরের বক্তৃতার কথা শুনে বলেন যে তাঁরা এই বক্তৃতার কথা জানতেন না (!)। মনে হয় উপাচার্য তাড়াহুড়া করে এলাহাবাদ যাবার আগে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে বোধ হয় সঙ্গীতভবনে এব্যাপারে নোটিশ পাঠানো হয়ে ওঠে নি। তারক সেনগুপ্ত বলেন যে সঙ্গীত ভবনের নাটক বিভাগে কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর পঞ্চাশ নম্বরের একটি পেপার আছে, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগে এই বিষয়ে কিছুই শেখানো হয় না, এবং এটি শেখানো অত্যন্ত জরুরী। তিনি আমাকে বলেন মোহন সিং ফিরে আসলে এব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, এবং আরো বলেন যে আমি সঙ্গীত ভবনে এবিষয়ে একটি ওয়ার্কশপের মতো দিলে নাটকের ছাত্র-ছাত্রীদেরও সেটা কাজে লাগবে ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী

ওই দিন সকালে আমার স্ত্রীকে নিয়ে উত্তরায়নে গিয়েছিলাম মিউজিয়াম দেখতে। মিউজিয়ামের কাউন্টারে একজন ভদ্রমহিলা ডিউটিরত ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই বলেন, *"আপনি কাল যা গান গেয়েছেন তার*

সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" পরের দিন বিকালে অধ্যাপিকা আলপনা রায়ের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি চা-এর ফরমাশ দিয়ে বল্লেন, "আপনি সেদিন 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী' গানে 'যেন হৃদয়ে বহুদূরে' জায়গাটা কী যে সুন্দর করলেন!"

এই কথাগুলি লেখবার উদ্দেশ্য আমার আত্ম-প্রচার নয়। আমি সব সময়েই মনে করি রবীন্দ্রনাথের গানের অপার সৌন্দর্য আমি এখনো তেমন কিছু ধরতে পারি নি, তাকে ধরবার চেষ্টা করছি মাত্র। এই আত্মপ্রচাররূপী কথাগুলি লিখলাম এগুলি একটা বিষয়ে আলোকপাত করে বলে। অনেকের ধারণা আছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বিশেষ গায়কী আছে, যেন একটা বিশেষ 'ঘরানা' থেকে উদ্ভূত এই গায়কী, এবং শান্তিনিকেতন এই 'ঘরানার' ধারক। আমার 'অ-শান্তিনিকেতনী' গায়কীতে গাওয়া গানের ওপর শান্তিনিকেতনের (দুজন) শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া তো এই ধারণা সমর্থন করে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী সম্বন্ধে আরো একটি অভিজ্ঞতাঃ সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভবনে একটি অতিথি-বক্তৃতা শুনে বাইরে বেরোতে এক দম্পতির সঙ্গে দেখা হলো এবং উভয় পক্ষ থেকেই কৌতুহলবশতঃ আলাপ-পরিচয় হলো। ভদ্রলোক চিত্রকর বিষ্ণু দাস, কলকাতায় থাকেন এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর ছবির প্রদর্শনী দিতে এসেছেন। স্ত্রী সুলেখা দাস আগে শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং এখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন। আমার পরিচয় জেনে এবং আমি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কণ্ঠবিজ্ঞান'-এর ওপর বক্তৃতা দিয়েছি শুনে তিনি বল্লেন,

"আচ্ছা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী-যে আজকাল রাখা হচ্ছে না এসম্বন্ধে আপনি কী বলেন?"

আমি বল্লাম, "রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী বলতে আপনি কী মীন করেন?"

"এই, যেরকম আগে গাওয়া হত!।"

আমি বল্লাম, "আপনাদের যদি সময় থাকে তবে রতন কুঠিতে আসেন, আমি আপনাদের কয়েকটা গান শোনাই, আপনারা নির্দ্বিধায় বলবেন আমার গায়কী আপনাদের মতে ঠিক হয় কিনা"।

রতন কুঠিতে তাঁদের নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে আমার ছোট পোর্টেবল্ হারমোনিয়ামটা ছিল সেটা বাজিয়ে তাঁদের কয়েকটা গান শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমার গায়কী সম্বন্ধে তাঁদের মত কী। ভদ্রলোক বল্লেন,"একটু অন্যরকম, তবে আমি আপত্তি করব না"।

আমি তখন বল্লাম, "আচ্ছা এবার আমি একটা গান করছি যেটা এ-গানের প্রচলিত গায়কী থেকে অনেকখানি অন্যরকম। আপনারা নির্দ্বিধায় বলবেন এ-গায়কী আপনাদের পছন্দ হয় কিনা"।

আমি গাইলাম আমার 'মহারাজ' সিডির প্রথম ও আমার নিজস্ব স্টাইলের গান "মহারাজ এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে"। গানটি শেষ করে বল্লাম, *"এবার বলুন"*।

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগে সুলেখা বল্লেন, ”গানটা আপনি যখন শুরু করলেন তখন আমি একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম, এভাবেতো এ-গানটা একেবারেই গাওয়া হয় না। পরে গানটার মধ্যে ডুবে গেলাম, এবং মনে হল আপনি ’অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন’ দেখাচ্ছেন।

যাঁরা ’অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন’ ব্যাপারটা জানেন না তাঁদের জন্য অল্প কথায় কলছি - মহাভারতের কাহিনী অনুয়ায়ী কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সারথী হিসেবে নিয়ে অর্জুন ফ্রন্ট লাইনে এসে রথ থেকে নেমে পড়ে বলে যে ”আমি যুদ্ধ করব না, আমার ভাইদের আমি মারতে পারব না।” তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে সৃষ্টি সম্বন্ধে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত দীক্ষা দেন, এবং সমস্ত ভগবত-গীতা অর্জুনের ওপর সেখানেই ’নাজেল’ হয়। অর্জুন তখন বলে যে ”তুমিই তো ভগবান, আমি তোমাকে তোমার আসল রূপে দেখতে চাই।” তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপার জ্যোতির্ময় রূপে অর্জুনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং অর্জুন থর থর করে কেঁপে সেই জ্যোতির সামনে লুটিয়ে পড়ে।

সত্যিই তো ’মহারাজ’ এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যেন অর্জুনের সেই ’বিশ্বরূপ’ দর্শণ-এরই বর্ণনা দিয়েছেন! আমার এ গানটি গাইবার স্টাইলে সুলেখাও সেই ’বিশ্বরূপ’ দেখলেন! আমার মনে হলো আমি যেন সঙ্গীতে "নোবেল প্রাইজ” পেলাম!!

মনে পড়ছে বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় অধ্যাপক সরওয়ার মোর্শেদের বাসায় আমি আর ডক্টর সনজিদা খাতুনের গান গাইবার একটি আসর হয়েছিল, সেখানে আমি এই গানাট গাই, এবং গাইবার আগে ডক্টর সনজিদাকে বলি, ”আমি একটা গান গাইছি যে গানের স্টাইল হয়তো আপনার পছন্দ হবে না”। ডক্টর সনজিদা গানটি শেষ হলে বলেছিলেন, ”আপনি তো ’মহারাজ’কে একেবারে সামনে বসিয়ে দিলেন - আমার খুব ভালো লেগেছে”। ডক্টর সনজিদারও গানের গায়কী সম্বন্ধে তেমন কোন ’গোঁড়ামী’ ছিল না।

কণ্ঠবিজ্ঞানের ক্ষমতা

শান্তিনিকেতনে আমি বিশ্ববিদ্যালয় গেস্ট হাউস ’রতন কুঠিতে’ ছিলাম। সেখানে আমার কাছে ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একজন মহিলা এসে হাজির। পরিচয় দিলেন নাম নন্দিতা সর্বাধিকারী, সঙ্গীতে এম,এ মিউজ ১৯৯৫ সালে, আর ইকনমিক্স-এও এম,এ পাশ করে ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিট্যুটে চাকরী করেন। বল্লেন তিনি ভালো গান করতেন, সম্প্রতি হয়তো শরীরের কিছু অসুবিধার কারণে গান তত ভালো হচ্ছিল না, কিন্তু আমি ২রা ডিসেম্বরের বক্ত্‌তার মাঝে-মাঝে যে অল্প কয়েকটা ভোকাল এক্সারসাইজ নমুনা হিসেবে দেখিয়েছিলাম তিনি গত তিন দিন সেইগুলি করে এর মধ্যেই ফল পেয়েছেন, তাঁর কণ্ঠ আগের চাইতে খুলে যাচ্ছে। আমাকে অনুরোধ করলেন কণ্ঠ-সাধনায় আরো কিছু গাইডেন্স দিতে। আমি তাঁকে সেই দিন ও তার পরের দিন আরো কিছু গাইডেন্স দিলাম। তার পরের দিন সকালে তাঁর আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ পিতা শ্রী ললিতকুমার মজুমদার রতনকুঠিতে আমার কাছে এসে হাজির। বল্লেন তাঁর মেয়ে তো আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে, আগে ভালো গাইতো সম্প্রতি কণ্ঠ পড়ে গেছে, কিন্তু বাসায় আমার দেখানো "গো-গো-গো” ইত্যাদি এক্সারসাইজ করে কণ্ঠ স্পষ্টতই খুলে যাচ্ছে। আমাকে অনুরোধ করলেন তাকে যেন আমি আরো সাহায্য করি। কণ্ঠবিজ্ঞানের এই শক্তি সম্বন্ধে আমি নিজে অবশ্য জানতাম আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যেজন্য আমি ”জাতে শিক্ষক” এই জ্ঞানটি ছড়িয়ে দিতে নেমেছি, এবং বলা বাহুল্য এভাবে অন্যের ওপর হাতেনাতে ফল দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

সঙ্গীতভবনে আমন্ত্রণ

অধ্যাপক মোহন সিং পরের দিন শান্তিনিকেতন ফিরে আসলে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠবিজ্ঞান শিখিয়ে দিতে, তবে সেসময় ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা চলছিল বলে তিনি আমাকে এজন্য পরে আর একবার শান্তিনিকেতন আসতে অনুরোধ করেন। কোন্ সময় আসলে সুবিধা হয় একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-যে মার্চ-এপ্রিলের দিকে দোল-পূর্ণিমা উৎসবের পরে আসলে সুবিধা হয়।

৮ই ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পার্টিসিপেটরী এ্যাকশন রিসার্চের ওপর আমার বিশ্বব্যাপী কাজ, সাম্প্রতিক বাংলাদেশে রিইব-এর মাধ্যমে কাজ এবং রবীন্দ্রনাথের ”আত্মশক্তি” প্রত্যযের ওপর একটি সেমিনার দিই যা নিয়ে আমার বক্তৃতার পর সাড়ে তিনঘন্টব্যাপী গভীর আলোচনা চলে। বর্তমান রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না বলে এর ওপর এখানে আর কিছু লিখছি না।

সল্ট লেক সিটিতে

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এক সন্ধ্যায় সল্ট লেক সিটিতে কবি কালীকৃষ্ণ গুহের বাসায় তাঁর আমন্ত্রনে সল্ট লেকের একটি সাংস্কৃতিক গ্রুপের জন্য ১৫ সদস্যদের ঘন্টা দুয়েক কণ্ঠসাধনার ওপর গাইডেন্স দিই। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সুগায়িকা সুমিতা দাস যাঁর একটি একক অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা উঠেছিল কয়েক মাস আগে দেশ পত্রিকায়। (২০০৩ সালের মে মাসেও প্রধানত: সুমিতা দাস-এর আগ্রহে ও উদ্যোগে কবি কালীকৃষ্ণের বাসায় একটি আরো বড়ো গ্রুপ আমার সঙ্গে ঘন্টা চারেক বসেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের শৈল্পিক পরিবেশনা ও কণ্ঠসাধনার ওপর আমার কাছ থেকে শোনবার জন্য।) সুমিতা দাস প্রতিষ্ঠিত গায়িকা হয়েও যেভাবে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমার আলোচনা শুনছিলেন এবং নোট নিচ্ছিলেন তা আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করে।

সঙ্গীতভবনের পথে

মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি আবার সস্ত্রীক কলকাতা হয়ে অজন্তা-এলোরা এবং ভুবনেশ্বর-কোনার্ক দেখতে যাই, এবং যাবার আগে ঢাকা থেকে মোহন সিং-কে ফোন করে এবং চিঠি লিখে জানাই-যে আমি মার্চের শেষের দিকে শান্তিনিকেতন যেয়ে কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর পূর্ণাঙ্গ লেকচার বা ওয়ার্কশপ জাতীয় কিছু দিতে পারি। মোহন সিং আমাকে জানান যে তিনি এব্যাপারে ব্যবস্থা করবেন। কলকাতায় যেয়ে মোহন সিংকে ফোন করলে তিনি বলেন যে এর মধ্যে সঙ্গীত ভবনের প্রিন্সিপাল বদলে গেছে, এবং আমার চিঠি তখন নতুন প্রিন্সিপাল অধ্যাপক অশোক গাঙ্গুলীর হাতে। আমি অধ্যাপক অশোক গাঙ্গুলীকে ফোন করি, এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শান্তিনিকেতনে যেয়ে সঙ্গীতভবনে কণ্ঠবিজ্ঞান শেখাতে আমন্ত্রণ করেন। বলেন যে তিনি জানেন কণ্ঠবিজ্ঞান বিশ্বে অত্যন্ত উন্নত মানে পৌঁছেছে, এবং তাঁর নিজের কণ্ঠও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চর্চা করে আরো উন্নত করা প্রয়োজন। জিজ্ঞেস করেন কতখানি সময় নিতে চাই।

আমি বলি যত বেশি সময় পাই তত ভালো করে সব বোঝাতে পারি। তিনি বল্লেন, *"চলে আসুন, তারপর দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।"*

উইলিয়াম রাদিচী ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মান

শান্তিনিকেতন যাবার আগে কলকাতায় থাকাকালীন দেবাশীষ রায় চৌধুরী আমাকে আমন্ত্রণ করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রকাব্য-অনুবাদক ও রবীন্দ্রগবেষক অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচী তাঁর বাসায় চা খেতে আসবেন এবং "গানের লীলার সেই কিনারে"-র সিডিটি দেখবেন, এই আসরে যোগ দেবার জন্য। উইলিয়াম রাদিচীর সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা, এবং আমি তাঁর অনায়াসে বাংলা বলা শুনে মুগ্ধ হই। রাদিচী বলেন-যে তিনিও ৪ঠা এপ্রিল শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন বিশ্বভারতী থেকে একটি সম্মান গ্রহণ করতে, এবং এই উপলক্ষে "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" এই শিরোনামে একটি বক্তৃতা দেবেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম তিনি আমাকে ওইখানেই বলে দেন: রবীন্দ্রসঙ্গীত সারা বিশ্বে গেয়ে প্রচার করা প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের বিশ্বমানের 'প্রফেশনাল' হতে হবে, যাতে বিদেশে বিশ্বমানের সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত শ্রোতারা তাদের পরিবেশনা শুনতে আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশনা এখনো এই মান থেকে অনেক দূরে। গভীর রবীন্দ্র-অনুরাগী রাদিচীর এই বক্তব্য সব রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিল্পী-সংস্থা ও বিদ্যায়তনের জন্য গভীরভাবে অনুধাবনীয়।

সঙ্গীতভবনে ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা

২৯শে মার্চ শান্তিনিকেতন যেয়ে ৩০শে মার্চ সঙ্গীত ভবনে অধ্যাপক অশোক গাঙ্গুলির অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। অত্যন্ত আন্তরীক, অমায়িক মানুষটি। পোষাকে একেবারে সাধারণ একটি মানুষের মতো। বল্লেন ২রা এপ্রিল সমস্ত দিন আমার ওয়ার্কশপ হবে, সকাল ৯টা থেকে সাড়ে বারোটা, তারপর লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করে সবাই ফিরে আসবে সাড়ে চারটায়, আমার ক্লাশ চলবে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত - মোট ছয় ঘন্টার ক্লাশ। সঙ্গীত ভবনের সব বিভাগের সব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য - রবীন্দ্রসঙ্গীত, ক্লাসিকাল সঙ্গীত, নাটক, তবলা এসরাজ ইত্যাদি সব বিভাগের সব ছাত্র-ছাত্রী - এই ওয়ার্কশপে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে তাদের নিয়মিত ক্লাশ সাসপেন্ড করে, এবং তারা এই ওয়ার্কশপে উপস্থিতির ওপরই এই দিনের জন্য তাদের পার্সেন্টেজ পাবে। অধ্যাপক তারক সেনগুপ্তও সেখানে উপস্থিত হন। সঙ্গীত ভবনের শিক্ষকদের নতুন বিষয় সম্বন্ধে জানবার এবং সব ছাত্র-ছাত্রীদের জানাবার এই আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

আমি আমার *"অসীমের স্পন্দ: রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা"* বইটির একটা কপি সঙ্গীত ভবনের লাইব্রেরীর জন্য উপহার স্বরূপ অশোক গাঙ্গুলির হাতে দিই।

সঙ্গীত ভবনের হল বিল্ডিং-এর সামনে বড়ো ব্ল্যাকবোর্ডে নোটিশ পড়ে যায় ২রা এপ্রিল আমার সারাদিনের ওয়ার্কশপ সম্বন্ধে। আমি সঙ্গীত ভবনের স্বাদ নেবার জন্য সেদিন অনেকক্ষণ খোলা হল ঘরের বারান্দার কিনারায় ঘাসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকি। বিভিন্ন ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী আমার সঙ্গে পরিচিত হতে আসে, এবং সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কন্ঠের নানান্ সমস্যা - যথা, কণ্ঠ উঁচু পর্দায় সহজে যায় না, গাইতে গেলে গলা ব্যথা করে, ইত্যাদি - বলে জিজ্ঞেস করে কণ্ঠবিজ্ঞানে এসব সমস্যার সমাধান আছে কিনা। আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলি-যে এসব সমস্যাই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

গান গাইবার জন্য হয়, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কণ্ঠচর্চা করলে ও গান করলে এসমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। একটি অন্ধ ছাত্র আসে তার মায়ের সঙ্গে সেও সঙ্গীত ভবনে রবীন্দসঙ্গীতের ছাত্র, এবং তারো কণ্ঠের বিভিন্ন সমস্যা আমাকে ব'লে আমার কাছ থেকে আশ্বাস নেয় এগুলি সব দূর করবার উপায় আছে। বাংলাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীও আসে, তারা সবাই মফস্বল অঞ্চল থেকে - যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া - আগত।

পরের দিন উইলিয়াম রাদিচীও রতন কুঠিতে আসেন সেই সন্ধ্যায় চীনা ভবনে তার সন্মাননা ও বক্তৃতা। আমি তার অনুষ্ঠানে যেতে পারি নি পাঠ ভবনের অধ্যাপক ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় একই সময় আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান 'ছিন্নপত্র' -ভিত্তিক একটি নতুন ডকুমেন্টরি ডিভিডি দেখাবার জন্য। রাদিচীর সঙ্গে পরের দিন সকালে রতন কুঠির বারান্দার কার্ণিশে বসে ঘন্টাখানেক আড্ডা দিই এবং বিদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্বমঞ্চের উপযোগী মান নিয়ে পরিবেশন করবার প্রশ্নটি, যে-প্রশ্নটি রাদিচী তাঁর বক্তৃতায় উত্থাপন করেছিলেন, আলোচনা করি।

সঙ্গীত ভবনের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সীতাংশু রায়কেও - যিনি আমার ২রা ডিসেম্বরের বক্তৃতায় এসেছিলেন - ফোন করে আমার পরের দিন সঙ্গীত ভবনের ওয়ার্কশপের কথা জানাই। সীতাংশু রায় বল্লেন যে তিনিও আমার ২রা ডিসেম্বরের বক্তৃতায় কণ্ঠচর্চার জন্য উদাহরণ হিসেবে যে সামান্য কিছু নির্দেশ দিয়েছিলাম তা অনুসরণ করে উপকার পেয়েছেন, কিন্তু দু:খের বিষয় তিনি পরের দিন সকালেই বম্বে যাচ্ছেন বলে আমার ওয়ার্কশপে থাকতে পারবেন না, আগে জানলে হয়তো প্রোগ্রাম বদলে থেকে যেতে পারতেন।

নাট্যদলের সঙ্গে

সেদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত ভবনের ও বাইরের নাট্যশিল্পীদের একটি গোষ্ঠী আমাকে নিয়ে যায় তাদের একটি সাপ্তাহিক জমায়েত হয় এক নাট্য-অনুরাগীর বাসায় সেখানে, আমার কাছ থেকে নাট্যাভিনেতাদের জন্য উপযোগী কিছু জানবার জন্য। অধ্যাপক তারক সেনগুপ্ত সহ প্রায় তিরিশ জনের মতো নানান বয়সের পুরুষ ও মহিলা নাট্যশিল্পী ও নাটকের ছাত্র-ছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারক সেনগুপ্ত আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওদের বলেন আমাকে তাদের সমস্যাবলী বলতে এবং প্রশ্ন করতে। প্রশ্নগুলি প্রধানত: দূরের দর্শক-শ্রোতাকে শোনাবার জন্য উঁচু পর্দায় চেঁচাতে গেলে কণ্ঠ ভেঙ্গে যায়, ব্যথা হয়, এর প্রতিকার কী এই ধরণের ছিল। উত্তরে আমি কণ্ঠতে কোনরকম চাপ না দিয়ে ডায়াফ্রাম ও তলপেট দিয়ে শ্বাস নেয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়া দেখাই। অধ্যাপক তারক সেনগুপ্তও বলেন যে এটাই শ্বাস নিয়ন্ত্রনের সঠিক পদ্ধতি যে কথা সঙ্গীত ভবনের নাটকের ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকেও আছে। আমি সবাইকে কোমর ও তলপিঠ থেকে নীচের দিকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত পেশীশক্তি বাড়িয়ে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটা ব্যায়াম দেখাই।

কণ্ঠসাধনার ওপর ওয়ার্কশপ

আমার কণ্ঠসাধনার ওপর ওয়ার্কশপটি সঙ্গীত ভবনের নীচের তলায় বিরাট একদিক-খোলা হলটিতে হয়। সব বিভাগের মোট ১৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, এবং সব বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক গোরা সর্বাধিকারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত থাকায় ওয়ার্কশপে থাকতে পারেন নি, শুধু

শুরুতে এসে আমাকে সৌজন্য সম্ভাষণ করে চলে যান। ডেপুটি প্রিন্সিপাল অধ্যাপক তারক সেনগুপ্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এদিনের সারা দিনের 'ক্লাশ' একটানা আমি নেব এবং সব ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের এদিনের পার্সেন্টেজ এই ক্লাশে উপস্থিতি থেকে পাবে এই কথা বলে প্রিন্সিপাল অশোক গাঙ্গুলীকে আহ্বান করেন আমাকে সবার কাছে পরিচিত করিয়ে দিতে। অধ্যাপক গাঙ্গুলী আমার "অসীমের স্পন্দ" বইটা হাতে নিয়ে সেটা দেখিয়ে প্রথা অনুযায়ী সিনিয়র হিসেবে আমাকে "গুরুজন" বলে আখ্যায়িত করে আমার সাঙ্গিতিক মহলে বিচরণের একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান সবার কাছে পেশ করেন।

এরপর আমি আমার ওয়ার্কশপ শুরু করি। শুরুতেই আমি উইলিয়াম রাদিচীর দাবীর কথা বলে নিজেও দাবী করি যে সঙ্গীত ভবনের দায়িত্ব সারা বিশ্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীকে পৌঁছে দিতে এগিয়ে আসা - রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশ্বপ্রেম, মানুষে-মানুষে ও মানুষে-প্রকৃতির মধ্যে মিলনের বাণী আজকে মানব সভ্যতার মহা সংকটের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং এই মিশনের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের বিশ্বমানের কণ্ঠ এবং সমুদ্রের ঢেউএর মতো সুর ভাসিয়ে দেয়ার দক্ষতা আয়ত্ব করতে হবে।

সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠবিজ্ঞান জানবার আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করে ও অনুপ্রেরণা দেয়। আমি তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিই, এবং আমার পার্টিসিপেটরী স্টাইল অনুযায়ী আমি আলোচনা করেছি এরকম কোন কথার ওপর প্রশ্ন আসলে ওদের মধ্য থেকেই প্রশ্নটির উত্তর কেউ দেবে বা দিতে চেষ্টা করবে কিনা এই আহ্বান করি। এতে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনরকম সংকোচ না দেখিয়ে আগ্রহের সঙ্গে আমি দম্ নিয়ন্ত্রনের জন্য যেসব দৈহিক ব্যায়াম দেখাই সেগুলি করবার চেষ্টা করে।

সকালের সেশনে আমি প্রধানত: শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং কবিগুরুর গানের বাণীর বৈচিত্রময় অর্থ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রকম জোয়াড়ী, 'রং' ইত্যাদি দেবার কৌশল আলোচনা করি। অধ্যাপক অশোক গাঙ্গুলীও গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁকে বিভাগীয় কাজে তাঁর অফিসে চলে যেতে হয়, এবং যাবার আগে তিনি আমার কাছে এসে অনুরোধ করে যান যে বিকালের সেশনে তিনি ফিরে আসলে তারপর যেন একটি বিশেষ প্রশ্ন (সুর খুব হাল্‌কা করে ছাড়া) আলোচনা করি তিনি এটি ভালো করে বুঝতে চান বলে।

দিনের প্রথম ভাগের মাঝামাঝি একটি ছোট বিরতির সময় আমাকে একজন শিক্ষক বলেন যে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহন সিংও ডায়াসের পেছনে উপস্থিত আছেন। আমি পেছন ফিরে দেখি তিনি পেছনের দেয়ালের সামনে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বসে আছেন একটি হুইল চেয়ারে তাঁর পায়ে অসুবিধা বলে। আমাকে তো তিনিই আমন্ত্রণ করেছিলেন সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠবিজ্ঞান শিখিয়ে দিতে। আমি তাঁর কাছে যেয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে সম্ভাষণ বিনিময় করলাম।

এই বিরতির সময় সেই অন্ধ ছাত্রটিও তার মায়ের সঙ্গে আমার কাছে আসে, এবং যেসব দৈহিক ব্যায়াম সে বুঝতে পারে নি সেগুলি তাকে হাত-পেট ইত্যাদি ধরে ধরে আমি বুঝিয়ে দিই।

বিকালের সেশনে আমি প্রধানত: কণ্ঠের রেঞ্জ বাড়াবার জন্য স্বরযন্ত্রের কিছু 'ভোকাল জিমনাস্টিক্‌স'-জাতীয় এক্সারসাইজ দিই। এই এক্সারসাইজগুলি - "গো-গো", গাগ্-গাগ্" ইত্যাদি - অভিনব এবং অপরিচিতদের কাছে সহজেই বেজায় হাসির উদ্রেক করে। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমে আমার কাছে

এগুলি শুনে প্রাণ ভরে হেসে নিতে আহ্বান করি। তারাও আমার "গো-গো" ইত্যাদি শুনে খুব করে হেসে নিয়ে তারপর নিজেরা মহা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়।

সেশন শেষ হলে ছাত্ররা অনুরোধ করে "মধুরেন সমাপয়েৎ" হিসাবে একটা গান করতে। আমি 'তুমি রবে নীরবে' গানটি গাই গানটির অর্থ অনুযায়ী আমি যেভাবে ভয়েস মডুলেশন করি তার ব্যাখ্যা করে ।

তারপর আমার ছাত্র-ছাত্রীদের অটোগ্রাফ দেবার ও প্রণাম নেবার পালা।

সব শেষ হলে কয়েকজন ছাত্র আমার কাছে নাটক বিভাগের জম্মু থেকে আসা একটি ছাত্রকে নিয়ে আসে যে সঙ্গীত চর্চাও করে। নাম বীর সিং । ছেলেটি ভালো বাংলা জানে না। আগের সন্ধ্যায় নাটকের গ্রুপের সঙ্গে আলোচনাতেও সে ছিল। সে হিন্দিতে বল্লো যে সে আগের দিন মূলত আমার 'বডি ল্যাংগুয়েজ' ফলো করে যা বুঝেছে তাই রাতে ও সকালে অনুশীলন করেছে, এবং সে আগে চড়ার গান্ধারে যেতে পারতো না, সকালে উঠে দ্যাখে-যে দম্ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আমি যা দেখিয়েছি তা অনুসরণ করে সে গান্ধারে যেতে পারছে! ধন্য কণ্ঠবিজ্ঞান!!

ওয়ার্কশপ শেষ করবার আগে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়েছিলাম যে আমি আর একদিন শান্তিনিকেতন থাকবো তাদের জন্য, যদি তারা কেউ আমার কাছে প্রাইভেটলি কিছু বুঝতে চায় বা আর কোন গাইডেন্স চায় তারা রতন কুঠিতে আসতে পারে। একগাদা ছেলে-মেয়ে বলে যে তারা সকালে ক্লাশ করে বিকালে আমার কাছে আসবে।

সেই রাতে বাংলাদেশ থেকে আগত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সিনিয়র ছাত্র রেফুল আমাকে সুগায়িকা এবং সঙ্গীত ভবনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের বাসায় নিয়ে যায়। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ও আমার ওয়ার্কশপে ছিলেন। তখন রাত দশটা হয়ে গেছে, তবু স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় হারমোনিয়াম নিয়ে এসে আমার সামনে দিয়ে বল্লেন সারা দিন লেকচার দিয়ে আমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, তবু তাঁর স্বামীকে একটা গান শোনাতেই হবে আমার 'তুমি রবে নীরবে' গানটা এত ভালো হয়েছিল, এবং অত ওপরে গলা এত অনায়াসে চলে গিয়েছিল। আমি বলি যে কণ্ঠবিজ্ঞানের দৌলতে আমার সারাদিন লেকচার দিযেও কোন ক্লান্তি আসে না। আমি *'প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর'* গানটি গেয়ে শোনাই।

পরের দিন সকাল আটটার সময় রতন কুঠিতে এক মহিলা আমার কাছে আসলেন, পরিচয় দিলেন প্রখ্যাত ধ্রুপদ শিল্পী ও শিক্ষক কাবেরী কর। তালিম পেয়েছেন ওস্তাদ রহিম ফহিমুদ্দীন খান ডাগর, ওস্তাদ সায়েদুদ্দীন খান ডাগর, ওস্তাদ আসাদ আলী খান বীনকর এঁদের কাছে, সঙ্গীত সম্মেলন বম্বে থেকে 'সুরমাণি" খেতাব পেয়েছেন, বানারসী ধ্রুপদ মেলা থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলাকর সম্মান' পেয়েছেন। কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপিকা এবং শান্তিতনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের রীডার। তিনি আগের দিন আমার ওয়ার্কশপে ছিলেন, এবং এই দিন ক্লাশ নিতে যাবার আগে আমার কাছে আসেন কণ্ঠসাধনা সম্বন্ধে আরো কিছু আলাপ করতে। তিনি বিশেষ করে কণ্ঠের জোয়াড়ী বিভিন্ন রকম করবার টেকনিক্ আমার কাছ থেকে আর একটু বুঝে নেন, এবং বলেন যে তিনি বড়ো বড়ো ওস্তাদের কাছে শিখেছেন, কিন্তু আমার কাছে (অর্থাৎ কণ্ঠবিজ্ঞানের কাছে - আমি তার বাহন মাত্র) কয়েকটা জিনিষ শিখেছেন যা তাঁদের কাছেও শেখেন নি। তিনি বলেন "আমি আপনার মেয়ের মতো" । তাঁর বিনম্র বিণীত ব্যাবহার আমাকে মুগ্ধ করে ।

বিকেলে পিল পিল করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী রতন কুঠিতে এসে গেল। সব মিলিয়ে জনা তিরিশেক হবে। প্রথমে ছেলেরা আমার সঙ্গে বসলো, তারপরে মেয়েরা। কেউ কেউ ক্ল্যারিফিকেশন চাইলো আগের দিন যা বলেছি তার কোন কোন ব্যাপারে। কেউ কেউ তাদের বিশেষ কণ্ঠ সমস্যা বিষয়ে গাইডেন্স চাইলো। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি মেয়ে বল্লো তার নীচের দিকের স্বর আড়ষ্ট হয়ে থাকে, খোলা ভাব হয় না। আমি তাকে বল্লাম নীচের দিকে অর্দ্ধ-স্বরবর্ণ দিয়ে স্বর উচ্চরণ শুরু করতে। ওরা কেউ অর্দ্ধ-স্বরবর্ণ (’ডবলিউ’ ও ’ওয়াই’) কাকে বলে জানতো না। বুঝিয়ে দিলে মেয়েটি ওইভাবে নীচের স্বর উচ্চরণ করে খোলা স্বর পেয়ে গেল। তখন সে মহা খুশি!

সেই জম্মুর ছেলেটিও এসেছিল এবং আমার লেকচারের অনেক কথা ভাষার সমস্যার জন্য বোঝে নাই বলে গ্যাপগুলি ভরে নিল। তারপর তার নাম-ঠিকানা দিল কোনদিন আমি জম্মু -কাশ্মীর যেতে চাইলে সে সব ব্যাবস্থা করে দেবে বলে!

যাবার আগে ছেলে-মেয়েরা বলে গেল আমাকে আবার আসতেই হবে, এবং তারা এর ব্যবস্থা করবে!

বাংলাদেশের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে আমাকে বলে যে আগের রাতে হোস্টেল থেকে হোস্টেল "গো-গো” শব্দে মুখরিত হয়ে গেছিল, সমস্ত সঙ্গীত ভবনে ছাত্র-মাস্টারদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেছে, এবং তারা যে কী গর্বিত তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। এরকম সফল ওয়ার্কশপ নাকি সঙ্গীত ভবনে বহুদিন হয় নি।

উপসংহার

পশ্চিম বাংলার সঙ্গীত মহলের যে চরিত্রটি আমাকে মুগ্ধ করে তাহলো, যত বড়ো শিল্পীই হউন না কেন তাঁর আরো শেখবার জন্য আকুলতা। ২০০৪ সালে পাটনার রবীন্দ পরিষদ থেকে ”রবীন্দ্র পুরষ্কার” নিয়ে যখন কলকাতায় ফিরে আসি তখন যাদবপুরের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ”সঞ্চারী কলাকেন্দ্র” আমার কাছে কণ্ঠবিজ্ঞান শেখবার জন্য একটি সারাদিনব্যাপী ওযার্কশপের ব্যবস্থা করে। তাতে দক্ষিণী, গীতবিতান এই ধরণের অগ্রণী রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন গ্রাজুয়েট ছিলেন; আরো ছিলেন বেশ কিছু নাট্যশিল্পী, এবং দেবাশীষ রায় চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী এবং নাট্যগীতি ও অপেরা পরিচালক, সারাদিন ওযার্কশপে নোটবই-কলম হাতে। তবে আরো আগে পশ্চিম বাংলার সঙ্গীতশিল্পীদের ’যতই জানিঁ আরো জানতে চাই’ এই তৃষ্ণার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বরেণ্য ও সবার নমস্য প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী নীলিমা সেনের মাধ্যমে, যে কাহিনি দিয়ে আমি আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার বয়ান শেষ করবো।

বেশ কয়েক বছর আগে নীলিমাদি ঢাকায় এসেছিলেন এক মাস ধরে ঢাকার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের তালিম দিতে। তিনি ক্লাশ নিতেন বিকেল বেলা, এবং আমি একদিন সকালে তাঁকে গান শোনাব বলে আমার বাসায় নিয়ে যাই। আমার অনেকগুলি গান শুনে তিনি প্রায় প্রত্যেকটি গানের পরে বিশ্লেষণ করেন আমি গানটি কীভাবে ইনটারপ্রিট করেছি - এরকম ইনটেলেক্চুয়াল গভীরতা আমি খূব কম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরই দেখেছি। কিন্ত এসব ছাপিয়ে তিনি আমাকে সব চেয়ে বেশি বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দেন আমি 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে’ গানটি গাইবার পর। গানটি শেষ হলে তিনি বলেন, তুমি 'সেদিন বাতাসে

ছিল তুমি জান' এই লাইনটি আবার গাও তো। আমি লাইনটি আবার গাইলাম। তখন তিনি বল্লেন, 'তুমি এই লাইনটি গাইতে কণ্ঠ বাতাসের মতো হাল্কা কেমন করে করলে?' আমি বল্লাম, 'আমি রেয়াজ করি কণ্ঠ ওইরকম করে তৈরী করবার জন্য।' তিনি বল্লেন, 'কেমন করে রেয়াজ করো আমাকে দেখাও !' আমি উঠে দাঁড়িয়ে 'সঙ্গীতের তাও পদ্ধতি' তে কণ্ঠের এরকম ক্ষমতা বাড়াবার জন্য হাত তুলে শান্ দেবার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেভাবে রেয়াজ করি যে পদ্ধতি আমার "অসীমের স্পন্দ" বইতে আলোচনা করেছি, এই পদ্ধতিটা নীলিমাদিকে দেখালাম। নীলিমাদি তখন বল্লেন, 'আমাকে এগুলি কিছু লিখে দেবে? যদি আমার কণ্ঠও এরকম করতে পারি!" আমি দু-শীট কাগজে এগুলি কিছু লিখে একটা খামে ভরে নীলিমাদিকে দিয়েছিলাম এবং তিনি সেটা সযত্নে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা নীলাঞ্জনা আমাকে পরে বলেছিল যে নীলিমাদি শান্তিনিকেতন ফিরে যেয়ে তাকেও একথা বলেন। এব্যাপারে অবশ্য আমার কোন কৃতিত্ব ছিল না, ছিল নীলিমাদিরই যতই-জানি-আরো-জানবার স্পৃহার - আমি তো তখন তাঁর কাছে একটা 'বই'মাত্র, যার পাতা উল্টে তিনি দেখছেন এতে কিছু আছে কিনা যা তিনি জানেন না অতএব তাঁর এটা শিখতে হবে, 'বই'টা থেকে নোট করে নিয়ে যেতে হবে। আমি ছোট বলে আমার কাছ থেকে অজানা কিছু নিতে তাঁর অহংএ বাধবার প্রশ্নই ওঠে না - বই থেকে নোট করবার তো সকলেরি অধিকার আছে!

এই কাহিনীর ইতি টানছি সঙ্গীতভবনের ওয়ার্কশপের ওপর কলকাতার দৈনিক স্টেট্সম্যানের রিপোর্ট থেকে অল্প উদ্ধৃতি দিয়ে:

"সঙ্গীত ভবনের ছত্রছাত্রীরা অনেকেই বিজ্ঞানভিত্তিক কণ্ঠসাধনার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে ইতিমধ্যেই। অনেকেরই বক্তব্য, বিজ্ঞানভিত্তিক রেওয়াজে হাতে-হাতে ফল পেয়েছে তারা।...এই কর্মশালার পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নতুন এক অধ্যায় খুলে গেল বলে মনে করছে অনেকেই। (*"শান্তিনিকেতন থেকে",* দৈনিক স্টেট্সম্যান, কলকাতা, ১২.৪.২০০৬ বুধবার।)

স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতা?

ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এবছরের মে ও জুন মাসে প্রতি শুক্রবার "কণ্ঠবিকাশ" নামে কণ্ঠবিজ্ঞানের ওপর আমার একটা কোর্স ঘোষণা করেছে। প্রশ্নটা এখন মনে হয় এই দাঁড়াচ্ছে কারা আগে এই পথে এগিয়ে যাবে: শান্তিনিকেতন, না ঢাকা; পশ্চিমবাংলা, না বাংলাদেশ। এরকম একটা সুশীল প্রতিযোগীতা হলে মন্দ কী?

ঢাকা, এপ্রিল ২০০৬

ছবি:

১. সঙ্গীতভবনে ওয়ার্কশপে প্রিন্সিপাল অশোক গাঙ্গুলীর সঙ্গে।
২. ওযার্কশপে বক্তৃতারত।
৩. রতনকুঠির বারান্দায় সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে।